কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৫)

সে বার গ্রামে ফিরছিলাম এক বৈশাখে । বিস্তৃত মাঠ পেরিয়ে জমির আঁল ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে পথ । সোজা সোজি পথ । গ্রামে যাকে বলে কোনাচে পথ । সেই কোনাচে পথ কমিয়ে দেয় পথের দৈর্ঘ্য অনেক । তাই প্রতিবারই বাড়ি ফেরার পথ আমাদের কোনাচেই থাকতো । আর সে পথের বৈচিত্রও অন্যরকমের । বোশেখের শেষ দিকে পাট খেতগুলো মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আরও একটু উঁচু হোতো । আর সে পথের দু'ধার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাটের মাঝখান দিয়ে সরু আল পথের মসৃন রাস্তা । গড়ানো দুপুরের হেলে পড়া রোদে পাটের ছায়ায় সে পথ যেনো বিছানো কোন ছায়াপথ । অসম্ভব সুন্দর করে রাখা আগাছাবিহীন পরিস্কার সে পাটের খেত । তার আড়ালে লুকিয়ে থাকার কোন উপায় নেই । অনেক দূর অবধি পাটের ছায়ারা রোদের সাথে মিলেমিশে যেনো তৈরী করে রেখেছে এক বৈচিত্রময় ছায়া- রোদের কোন অবোধ্য রেখাচিত্র । মাঝে মাঝে ঈষৎ হলদে রংয়ের পাতাগুলো তাদের বয়সের ভারে খসে পড়ে গেছে পাটের শাখা থেকে । সেই ঝরে পড়া পাতারা মাটির উপরে বিছিয়ে রেখেছে আদরের নরম চাদর । কখনো শুকনো পাতাগুলোর উপর কোন পোকা-মাকড় পড়ে ভেংগে দিচ্ছে দুপুরের নিস্তব্ধতা । আমরাও পাটের দীর্ঘ ছায়া পথ ফেলে এগিয়ে চলেছি ধান খেতের আঁ ল পথ মাড়িয়ে । মাথায় এসে পড়ছে গ্রীস্মের খরতাপ । পুড়িয়ে দিচ্ছে ব্রস্মতালু তীব্র রোদের সে তাপে । আউশ ধানের সদ্য গজানো থোড় থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ রংয়ের ধানের কুঁড়ি । প্রজাপতি আর মৌমাছিরা চেটে পুটে খাচ্ছে সে নরম থোড় ধান । মাঝে মাঝে অচেনা কোন ফড়িং অথবা অজানা কোন পোকা নিজেকে চমকে দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে কান আর চোখ বাঁচিয়ে । দমকা বাতাসে গ্রীস্মের তীব্র গরমের হলকায় পুড়িয়ে দিচ্ছে আয়েশী মুখমন্ডল ।

অনেক দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের মহীরুহ সেই বট গাছটি । আহা, কত চৈত্র-বৈশাখের কর্মহীন অবসরগুলো কেটে গেছে আমাদের ওই বট গাছের তলায় । আমার প্রথম পড়া প্রায় সবগুলো উপন্যাসতো ওই বটতলায় বসেই পড়া । না, সেগুলো কোনো বটতলার উপন্যাস নয় । রাজলক্ষ্মী - শ্রীকান্ত কয়েক দুপুর পড়েই শেষ করি ওই হাঁটু সমান বয়সেই । বাবার মৃদু আপত্তি ছিলো - কিন্তু মায়ের উৎসাহে আর বড়মা (জেঠাই মা) -র প্রশ্রয়ে তা ধোপে টিকে নি । তাই গরমের ছুটির দিনের মাস দেড়েক সময়ের প্রত্যেক দিনের ভর-দুপুর ছিলো বট গাছের নীচে বসে বই পড়ার এক নিষিদ্ধ নেশা । পড়ন্ত দুপুরে বই হাতে যখন বাড়ি ফিরেছি মা আমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে,'' হা-রে । আজ কোন বইটি পড়লি।'' মায়ের মুখখানি কোন এক উজ্জ্বল আলোয় উৎভাসিত হয়ে উঠতো কখনো কখনো । হয়ত তার অতৃপ্ত কোন ইচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে আমার ভেতর দিয়ে। এভেবেই মা আমার উচ্ছসিত । যখন বাড়ি থেকে ঢাকায় আসি, বাড়িতে

ফিরলে মায়ের সেই একই জিজ্ঞাসা । লাইব্রেরিতে যাই কিনা ? কি কি বই পড়ি ? পাঠ্য -বইকে অবহেলা করি কিনা? প্রায় অর্ধযুগ প্রবাসে কাটিয়ে এবার যখন মায়ের কাছে গেলাম । আশ্চর্য , মা আমাকে বই পড়ার কোন কথাই জিজ্ঞেস করলো না । ছেলে ইংরেজ-মুল্লুকে থেকে যা পড়ছে - আমার ইস্কুল শিক্ষিকা মা নিজেই তা জানেন না হয়তো । নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই তাই নীরব থেকেছেন । কিংবা, পেট-পুরে দু'মুঠো খাবার সংগ্রহের জন্য যে গলদ-ঘর্ম পরিশ্রম করছি এখানে , মা হয়তো বুঝতে পেরেছেন সেটা। তাই বইয়ের কথা জিজ্ঞেস না করে এক চরম বিব্রতকর অবস্থা থেকেই মুক্তি দিয়েছেন আমার স্নেহময়ী জননী আমাকে।

যদিও কানাডার উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের প্রায় শ'তাধিক বাংলা বইয়ের প্রথম পাঠক ছিলাম আমিই। মাত্র বছর তিনেক সময় ছিলাম ওখানে । কলেজে পড়া রবীন্দ্রনাথকে আবার নূতন করে ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ হয়েছে তখনই । তাইতো অধিকাংশ সময়েই পড়ে থাকতাম পাঠাগারে । গ্রুপ স্ট্যাডির নামে কিছুক্ষন কাটিয়ে আবার মুখ গুজে পড়ে থাকতাম রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে । আত্মীয়-স্বজনহীন এই প্রবাসে সদ্যজাত ছেলেকে বাড়িতে রেখে পাঠাগারে গিয়ে পাঠ্যবইয়ের উছিলায় রবীন্দ্র চর্চা করা । শুধু যে মিথ্যে বলার অপরাধ তাই নয় ,সংসারের দায়িত্ব থেকে চরম অবহেলাও বটে । তাও আবার চড়া সুদে লোনের টাকায় পড়ালেখা করে । এই সুযোগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার সংসারের সর্বংসহা সহযাত্রী স্ত্রীর কাছে ।

যাহোক, আর কোন বঙ সন্তানকে দেখেছি কী কোন বাংলা বই তুলতে কিংবা পড়তে? মনে পড়ে না । জানিনা , আজ বছর চারেক পরেও আমিই একমাত্র পাঠক কিনা ওই বইগুলোর? অথচ, বাংলা সাহিত্যের অনেক দুস্প্রাপ্য এবং উল্লেখযোগ্য বই আছে কানাডার এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে । মহাভারত -রামায়নের সমস্ত সংস্করণ থেকে শুরু করে বঙ্কিম-শরৎ -রবীন্দ্র রচনাবলির সমস্তখন্ড । জসিম উদ্দিনের সোঁজন বাদিয়ার ঘাটের বাংলা-ইংরেজী -এমনকি হিন্দি অনুবাদও আছে সংগ্রহে । জানি না , কোন বাংলাপ্রেমিক কানাডার সর্ব-দক্ষিনের লোহা-লক্করের এই শহরের এক প্রায় অপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দান করে গেছেন সাত সমুদ্র তের-নদীর ওপার থেকে ব'য়ে নিয়ে আসা এই অমূল্য বইগুলো । বাংলা এবং বাংগালীর প্রতি ভালবাসার সেই মানুষটিকে আমার অন্তরের গভীর -গহীন থেকে জানাই অভিনন্দন । কিন্তু পাঠাগার কর্তৃপক্ষ কত দিন রাখবেন প্রায় - অপঠিত এই বইগুলো ? এক দিন হয়তো '' রিসাইকেল বিনে '' জমা হবে কোন এক অজ্ঞাত মহৎ মানবের বহু- আকাঙ্খার এই দানগুলো? এভাবেই যায় বুঝি কালের অতলে সব ? এত আবেগ। এতো ভালবাসা । নিজের জীবনের মতো নিজের সম্পদও এমনি ভাবেই ধূলো জমে জমে তলিয়ে যায় অলক্ষ্যে ?

এই যেমন নিজের গ্রামটিও কেমন অচেনা হয়ে আসছে দিন দিন । অচেনা হয়ে যাচ্ছে ছেলে বেলার বন্ধুরা । জীবনের প্রথম পনেরটি বছরতো কাটিয়েছি ওই গ্রামেই । আমাদের গ্রামে হাতে গুনে গুনে মাত্র বিয়াল্লিশটি পরিবারে প্রায় শ'দুয়েক মানুষ । যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবি । কিন্ত প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ছিল এক জন স্নাতক -ডিগ্রিধারী সে সত্তর দশকেও। কিন্তু পেশা সেই শিক্ষকতা । অধিকাংশই স্কুল শিক্ষক । কয়েক জন কলেজে । কিন্তু পৈত্রিক পেশা হাল-আবাদ আছে সব বাড়িতেই । এতে সংসারের আয়

যেমন বাড়ছে । তেমনি আশ পাশের গ্রামের গরীব মানুষদের কর্ম -সংস্থানও হচ্ছে । তাই দেখা যেতো প্রায় বাড়িতেই দু'এক জন কৃষিকাজের সহায়ক লোক থাকতো । আমরা বলতাম '' হাইল্যা '' । আমাদের বাড়িতে প্রায় বছর সাতেক যে ছেলেটি ছিল নাম '' বারেক '' । আমরা বলতাম বারেক ভাই । শুধু বছরে মাস দুয়েক নিজের বাড়িতে থাকতো সারাক্ষন। আর সারা বছর আমাদের বাড়িতেই সারাদিন, রাত হলে চলে যতো অদূরে নিজের গ্রামে স্ত্রী -সন্তানের কাছে। আবার প্রত্যুষে বারেকের আগমন । আমার বাবা সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিতো ,'' বারেক মিয়া—কৃষি মন্ত্রী ।'' আসলেই কৃষি মন্ত্রী বারেক মিয়া । আমার ইস্কুল শিক্ষক বাবা সমাজ সেবা থেকে শুরু করে খেলাধূলা- যাত্রা-নাটক নিয়েই মেতে থাকতেন সারাক্ষন । কোন জমিতে কি চাষ করতে হবে, কোথায়-কখন সার-বীজ দিতে হবে , কখন মজুরি লাগাতে হবে । এ সব কিছুই বারেক মিয়ার হেফাজতে । আর সংসারের আয় তো মায়ের ইস্কুলের বেতনভাতা আর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কয়েক একর জমির আয় । বাবার বেসরকারী হাইস্কুলের বেতনভাতার কত অংশ বাড়িতে আসতো বলা মুস্কিল । নিতান্তই প্রয়োজন না হলে বাবার ইস্কুলের বেতন সংসারের কাজে লাগতো বলে মনে হয় না ।

বারেককে কখনও কি মনে হয়েছে আমাদের পরিবারের বাইরের কোন মানুষ ? শুধু মাত্র কিছু সম্বোধন ছাড়া আর কেউ বলতেই পারবে না বারেক আমাদের পরিবারের কেউ না। আমরা ভাই-বোনেরা বলতাম ,'' বারেক ভাই ।'' বারেক আমার বাবাকে বলতো কাকাবাবু, মাকে ছোটমা আর আমাকে ছোটবাবু । শুধু আমাদের পরিবারে নয় ,প্রায় বাড়িতেই এ ধরনের মানুষ জন কাজ করতো । অধিকাংশই মুসলমান । গ্রামের কিছু হিন্দু গরীব পরিবারের কেউ কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করতো । কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম । জানি না, অর্থনীতির কোন কারণে হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক বৈষম্যের এই বিভাজন স্পষ্ট ছিলো তখন ? তবে ছোট বেলায় আমরা সাদা চোখে যেটা ভাবতাম তা হলো- অধিক সন্তান আর অশিক্ষাই মুসলমানের আর্থিক দূরাবস্থার কারণ । আজ মনে হচ্ছে , এটা সেই মূরগীতত্ত্বের মতোই ব্যাপার । ডিম না হলে মুরগী হয় না আবার ,মুরগী না হলেও হয় না ডিম । শিক্ষা ,পারিবারিক সিদ্ধান্ত, আর স্বচ্ছলতা যেনো সেই ডিম-মুরগীর চক্রাবর্তেই ঘুরছে এখনো।

(চলবে)

।। নভেম্বর ২৮ ,২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com